সীমাহীন মূল্যে কেনা স্বাধীনতার বিজয়, জানতে হবে, জানাতেও হবে নিরন্তর

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস পৃথিবীর আর সব স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ এবং জাতিসমূহ থেকে নানা বৈশিষ্ট্যে বিশেষভাবে আবশ্যকীয় পাঠ্য। এটি একটি রক্তাক্ত মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা। এর শুরুর ইতিহাস দীর্ঘ ২৩ বছরের পাকিস্তানি পরাধীনতার আমলকেও ছাড়িয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অন্তত ১০০ বছরের ইতিহাসকে ধারণ করে আছে। তবে প্রত্যক্ষ স্বাধীনতার রক্তাক্ত অধ্যায় আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলো পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের রাজনৈতিক সহায়ক শক্তিসমূহ। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে আমাদেরকে উচ্চারণ করতে হয়েছিলো "আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন"... বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে। এর কয়েক ঘণ্টা আগেই অপারেশন সার্চলাইট নামে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা এবং শাসকগোষ্ঠী নিরস্ত্র মানুষের ওপর ট্যাংক, কামান, বন্দুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো হত্যার উদ্দেশ্যে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তানের সামরিক ও রাজনৈতিক শাসকগোষ্ঠী অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই। পাকিস্তান যে পূর্ব বাংলার মানুষকে কোনো ভাবেই সহ্য করতে রাজি ছিলো না তার প্রমাণ পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম থেকেই তারা একের পর এক দিয়ে যাচ্ছিলো। অথচ পূর্ব বাংলার জনগণ একদিন পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র লাভের জন্য আন্দোলন করেছিলো। সেই পাকিস্তানেই পূর্ব বাংলার জনগণের ভাষা, সংস্কৃতি, গণতান্ত্রিক অধিকার, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং জীবনযাপনের মর্যাদাকর অবস্থা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হতে থাকে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম, ত্যাগ, তীতিক্ষা, দেশপ্রেম এবং আত্মমর্যাদার অধিকার অর্জনের জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন ছিলো তা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বৃহত্তর জনগণ করতে শিখেছে। ৬ দফা প্রদান করে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতাকামী জনগণের সম্মুখে মুক্তির সনদ উপস্থাপন করেন। নিজে এবং সহকর্মীরাসহ সকলেই পাকিস্তানিদের রোষানলে পড়েন। জেলে যান, বছর বছর কারারুদ্ধ থাকেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় রাষ্ট্রদ্রোহী হয়ে ফাঁসির কাষ্ঠে ওঠার অপেক্ষায় ছিলেন। সেখান থেকেই মানুষ প্রিয় নেতাকে মুক্ত করার জন্য গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি করে। '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ভেঙ্গে দেয় পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরব্যবস্থাকে। তখন সাধারণ নির্বাচন দিতে পাকিস্তান বাধ্য হয়। সেই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণ যে ম্যান্ডেট প্রদান করেছিলো তাতে হয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা বাঙ্গালির দীর্ঘদিনের আন্দোলন সংগ্রামে বেড়ে ওঠা নেতা শেখ মুজিবের হাতে দিতে হবে নতুবা স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ মুজিবকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনমানসের এমন পরিবর্তনশীলতার সামান্যতম উপলব্ধি করতে পারেনি। এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতি জনগণের এই প্রস্তুতি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে যা ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে দ্রুততর হতে থাকে। ১৯৭০ এর নির্বাচনের পর স্বাধীনতার বাস্তবতা যেমন তৈরি হতে থাকে, মানুষের মধ্যে মানসিকতাও দ্রুত বেগবান হতে থাকে। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে উচ্চারিত " এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম"- অনেকটাই তখন জানান দিয়ে গেলো আমরা স্বাধীনতার চূড়ান্ত লক্ষ্যে এবার প্রয়োজনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নেবো। পাকিস্তানিরা মনে করেছিলো অপারেশন সার্চলাইট নামিয়ে আমাদের নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে পোড়ামাটি নীতি বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু পাকিস্তানিদের সেই কাল্পনিক হিসাব শুরু থেকেই ব্যর্থ হতে থাকে। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তারের পর তার ঘোষিত স্বাধীনতার বাণী মানুষের কানে পৌঁছাতে দেরি হয়নি। মানুষ পাকিস্তানিদের প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখনো আমাদের প্রতিরোধের কোনো আয়োজনই ছিলো না। কিন্তু প্রতিটি মানুষ বুক চিতিয়ে হাতে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে মুখে জয় বাংলার স্লোগান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে নিরস্ত্র জনগণের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার জন্য। বঙ্গবন্ধুর সহযোগী রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্বল্প সময়ের মধ্যেই একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার জন্য নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে বৈধ উপায়ে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে থাকে। ১৯৭১ এর ১০ এপ্রিল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ জাতির জীবনে উপস্থিত হয়। বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে একটি বৈধ জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ছিলো এক অন্যন্য অসাধারণ ও বিরল ঐতিহাসিক ঘটনা। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। আমাদের একটি সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গঠনেরও ঘোষণা দেওয়া হয়। একইসঙ্গে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রও প্রচারিত হয়। জনগণ এসব আয়োজনের খবর শুনে গ্রাম থেকে নদী, মাঠ, পাহাড়, সীমান্ত অতিক্রম করে ছুটে যায় স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিজেদেরকে উৎসর্গ করার জন্য। ১৭ই এপ্রিল বৈদ্যনাথ তলায় এক অনাড়ম্বর অথচ তেজদীপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শপথ গ্রহণ এবং স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনে দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করা হয় সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রিয় আবাসভূমি বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত করার কথা। বাংলাদেশ এক চরম অনিশ্চিত অবস্থা থেকে কীভাবে দেশপ্রেম, মেধা, মনন ও সৃজনশীল রাষ্ট্রচিন্তার পুনর্গঠনের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনে একদিকে প্রস্তুতি গ্রহণ, অন্যদিকে মানুষকে সম্পৃক্ত করা আন্তর্জাতিকভাবে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া জাতির পক্ষে টানতে থাকে। এ এক চুম্বক আকর্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ সূচনা করেছিলো যার প্রতি ভারতবর্ষ, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউরোপ, উত্তর অ্যামেরিকাসহ বিশ্বে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ সমর্থন জানাতে থাকে। তবে সামরিক পাকিস্তানি শক্তির পক্ষে পৃথিবীর দুই পরাশক্তি এবং কিছু আরব রাষ্ট্র সমর্থন জানালেও পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও লড়াই করতে নেমে পড়েছিলো। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলায় অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, লুটপাট, নারী ধর্ষণ, অগ্নি সংযোগ, গণহত্যা , পুল, কাল্ভার্ট, ব্রিজ ধ্বংস করেও মানুষকে স্তব্ধ করতে পারেনি। এক শ্রেণির রাজাকার, আলবদর, আলশামস এবং পাকিস্তানি অনুগত বাহিনী সৃষ্টি করেও নিজেদের পায়ের নিচের মাটি শক্ত করতে পারেনি। দিন যতো এগুচ্ছিলো মুক্তিযুদ্ধ তত সুসংগঠিত হচ্ছিলো, ততো শ্রেণি, পেশা ও বাহিনীর মানুষ মুক্তিযুদ্ধে নিজেদের যুক্ত করে রণাঙ্গনকে সুসজ্জিত করতে থাকে। কমাস আগেও যে কৃষকের হাতে ছিলো লাঙল, জোয়াল আর চাষের গরু, তার হাতে এখন স্টেনগান, গ্রেনেড বোমা যা সে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করতে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলো। যে শ্রমিক আগে কলে কারখানায় কাজ করতো সেও একইভাবে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলো। যে ছাত্রের হাতে বই পুস্তক ছিলো তার হাতেও স্বাধীনতার অস্ত্র তখন শোভা পাচ্ছিলো। যে শিক্ষক ক্লাসে পড়াতেন তিনিও চলে গেলেন যুদ্ধে আর বিদেশে জনমত গঠনে। যে শিল্পী দেশে কোনো প্রকারে শিল্পচর্চা করে জীবন কাটাতেন তিনিও সীমান্ত পাড়ি দিয়ে গণসংগীত আর স্বাধীন বাংলা বেতারে মানুষকে উজ্জীবিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। বিদেশে অবস্থানরত যে বাঙালি কর্মকর্তা মোটামোটি সুখেই ছিলেন তিনিও দেশের স্বাধীনতার জন্য চাকরি ছেড়ে বিশ্ব জনমত

গঠনে বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করলেন। যে সাংবাদিক একদা পত্রিকায় সংবাদ লেখতেন তিনিও স্বাধীনতার পক্ষে দেশে বিদেশে লেখালেখি শুরু করলেন। বিদেশীরাও যুক্ত হলেন আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে কোথাও বা কনসার্ট আয়োজনে, কোথাওবা জনমত ও অর্থ সংগ্রহে । বিদেশী প্রেস, মিডিয়া সর্বত্র তখন বাংলাদেশ এক স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার আর্তনাদ ব্যক্ত করছিলো। ভারতের ইন্দিরা গান্ধী সরকার দেশে বিদেশে বাংলাদেশের পক্ষে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়েছিলো। এমনকি পাকিস্তানের অভ্যন্তরে কিংবা প্রবাসে অবস্থানরতরাও মুক্তিকামী বাঙ্গালির পাশে দাঁড়াতে দ্বিধা করেনি। বিশ্বের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে তখন ছোট বড় অসংখ্য উদ্যোগ এই বাংলাদেশকে ঘিরে চলেছিলো। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানিদের অত্যাচার এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, যুদ্ধ, আক্রমণ, সীমান্তের ওপাড়ে আশ্রয় শিবিরে ক্ষুধার্ত মানুষের যন্ত্রণা, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, স্বাধীনতায় নেতৃত্বদানকারী সরকারের নির্ঘুম রাত, নানা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ষড়যন্ত্র মোকাবেলা, ভারতের নানা গোষ্ঠী, পেশার মানুষের প্রসারিত হাত বাংলাদেশের পক্ষে নানা বক্তৃতা বিবৃতি, সাহায্য, সহযোগিতা এসব প্রতিদিন শক্তি সঞ্চয় করছিলো বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে তরান্বিত করতে। চরম অনিশ্চয়তা ধীরে ধীরে নিশ্চয়তার ভিত্তি তৈরি করতে থাকে।

পাকিস্তানিরা তখন কারাগারের অন্তরালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্র আটতে থাকে। এর বিরুদ্ধেও জনমত বিশ্বে উচ্চারিত হতে থাকে। পাকিস্তানে অবস্থানরত লক্ষ লক্ষ বাঙালি যে যেদিকে পারছিলো পালিয়ে আসার চেষ্টা করছিলো। আবার অনেকে বন্দিত্ব জীবনে আটকে পড়ে গিয়েছিলো। এ এক সীমাহীন বিচিত্র যন্ত্রণাদায়ক কষ্টকর মৃত্যুর মুখোমুখি দিনাতিপাত করার অভিজ্ঞতা। এরপরও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তখনো মানুষের মধ্যে বিন্দুমাত্র চিড় ধরাতে পারেনি। বিশ্বের রাজনীতি বিভক্ত হয়ে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের পক্ষে ভেটো প্রদান করে। বোঝা গেলো বাংলাদেশ বহির্বিশ্বে আর বন্ধুহীন নয়। জাতিসংঘেও বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের পক্ষে জোরালো যুক্তি উত্থাপিত হতে থাকে। দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনী আরো সাহসী হয়ে উঠতে থাকে। গ্রামেগঞ্জে তখন সুসংগঠিত মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ পাকিস্তানিদেরকে হটিয়ে দিতে থাকে । নভেম্বরের ২১ তারিখে ৩ বাহিনীর সমন্বয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গঠিত হয়। এই সেনাবাহিনীর চরিত্রেই ছিলো মুক্তিযুদ্ধ। গঠিত সেনাবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে মিত্রবাহিনী গঠন করে। আর তাতেই পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর মাথায় রক্ত টগবগিয়ে উঠে। ৩ ডিসেম্বর তারা ভারত আক্রমণ করে। সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের সরকার ভারতের নিকট স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি বৈধ উপায়ে প্রদানের দাবি করে। ৬ ডিসেম্বর ভারত এবং ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সেনা ও মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডের যৌথ নেতৃত্বে পাকিস্তানিদের হটানোর জন্য প্রবেশ করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যৌথবাহিনীর সম্মুখে দাঁড়ানোর সাহস পায়নি। চারদিক থেকে সব ঢাকা অভিমুখে পালাতে থাকে। পথে পথে প্রতিরোধের মুখে পড়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। নিরস্ত্র জনতার মুখে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কতটা অসহায় হয়ে পড়েছিলো সেটি সেই সময়ে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে। পাকিস্তানিরা যখন লেজ গুটিয়ে আসতে থাকে তখন আলবদর, আলশামস বাহিনী ১০ তারিখ থেকে নতুন করে বুদ্ধিজীবিদের হত্যার নীলনকশা বাস্তবায়ন করতে থাকে। পরাজয়ের পূর্বমুহূর্তে এই অপশক্তি বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবী নিধনে গুপ্তঘাতকের ভূমিকা পালন করে। কিন্তু তাতেও বাংলাদেশের বিজয় আর পাকিস্তানের পরাজয় ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। ১৬ই ডিসেম্বর বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তানের ৯৩ হাজার সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করে অস্ত্র জমা দিতে বাধ্য হয়। রচিত হয় বিজয় দিবস। ২৬ মার্চ যে স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিলো অজানা এক গন্তব্যের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ১৬ই ডিসেম্বর সেই আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটলো বিজয়ের মধ্য দিয়ে। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে তাই এক নয় দুটি দিন ইতিহাসের গৌরবে স্থান করে নিলো। এমনটি পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে স্বাধীনতার সঙ্গে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র পাওয়ার এই সংগ্রাম এক দীর্ঘ ঐতিহ্যমন্ডিত উপাখ্যানে ভরপুর। এই ইতিহাস এখনো অনেকের কাছেই অজানা। অনেক লিখিত দলিল পৃথিবীর নানা প্রান্তে আমাদের অজান্তেই এখনো রয়ে গেছে। দেশেও প্রতিটি ঘরে, গ্রামে, অঞ্চলে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে সীমাহীন দুঃখকষ্ট যন্ত্রণা আর গৌরবময় ঘটনা অনেকেই তুলে ধরতে পারেননি। দীর্ঘদিন দেশের রাজনীতিতে মুখে স্বাধীনতার পক্ষের কথা বললেও অন্তরে স্বাধীনতাবিরোধীদের রাজত্ব কায়েম ছিলো। রাজনীতি, সমাজ ও জনমানসের এক হীনমনস্ক গোষ্ঠী বাংলাদেশের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ এবং বিজয়ের ইতিহাসকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করেছিলো। কয়েকটি প্রজন্ম বিকৃত ইতিহাস পড়ে বা শুনে দেশকে ভুলভাবে দেখতে ও বুঝতে শিখেছে। কিন্তু সময় এসেছে নতুন খবর শোনার। এ খবর নতুন নয়, একাত্তরেরই নানা ঘটনার খবর যা এতদিন চাপা পড়েছিলো। এখন দেশে দেশে, এখানে সেখানে হাতে তুলে নিতে হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে সেই সব পক্ষ বিপক্ষ শক্তির নানা কথা ও ঘটনার বর্ণনা। নতুন প্রজন্মের কাছে ইতিহাসকে এই তথ্য উপাত্তে আমরা যতো বেশি তুলে ধরতে পারবো ততোবেশি নতুন প্রজন্ম জাতীয় শৌর্য, বীর্য ও ঐতিহ্যে চেতনা ও প্রেরণার সঙ্গী হবে। ইতিহাস অতীতের মহৎকে ধারণ করেই বর্তমানকে ভবিষ্যতের পথে চলার শিক্ষা দেয়। স্বাধীনতার ইতিহাস বিজয়ের এই মাসে যে বিশাল সমৃদ্ধি নিয়ে আমাদের সম্মুখে অপেক্ষা করছে, আমাদের তরুণদের হাতে ও চেতনায় তার এই ঢালা তুলে দিতে হবে। তবেই এই মহান ইতিহাসের শিক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনের অনুষঙ্গ হয়ে থাকবে।

#

লেখকঃ অধ্যাপক, ইতিহাসবিদ ও গবেষক।

পিআইডি ফিচার